তারিখ ... 23 FEB 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষায় অপসংস্কৃতির চর্চা!

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

মো. আসাদুল্লাহ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

বিষয়টি পুরনো। এ সম্পর্কে লেখালেখি, আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক অনেক কিছুই হয়েছে। কিন্তু সমাধান হয়নি। ভবিষ্যতে হবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এত কিছুর পর আবার নতুন করে লেখা হয়তো অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও লিখছি। বলা হয়, শিশু জাতি গঠনের মূল ভিত্তি। আগামী দিনের দেশ গড়ার কারিগর। শিশুর মানবাধিকার এবং সব শিশুর জন্য সেসব অধিকার অর্জন করতে হলে সব দেশের সরকারকে যে নিরিখগুলো অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, সেগুলো বিবৃত হয়েছে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে। সনদে বর্ণিত প্রতিটি অধিকার প্রত্যেক শিশুর মানবিক মর্যাদা ও সুষম বিকাশের জন্য অপরিহার্য। শিশু অধিকার সনদে ১৮ বছরের কম বয়সী প্রত্যেক শিশুর জন্য সংরক্ষণযোগ্য মানবাধিকারগুলোর রূপরেখা তুলে ধরে সনদে বর্ণিত দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালার আলোকে সেগুলো বাস্তবায়নের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যমান ১৯৭৪ সালের শিশু আইন রহিত করে প্রণয়ন করেছে শিশু আইন ২০১৩। নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধ কঠোরভাবে দমনে প্রণীত হয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০। জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ ১৯৭৯ ও শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯-এর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নারী ও শিশুর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, পারিবারিক সহিংসতা হতে নারী ও শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০। শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে প্রণীত সুদূরপ্রসারী রূপকল্প জাতীয় শিশুনীতি ২০১১-এ শিশুর সুরক্ষায় সব ধরনের সহিংসতা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, অবহেলা এবং শোষণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, প্রলোভন বা জোর করে জড়িত করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সংবর্ধনা বা পরিদর্শন উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের ক্লাস বন্ধ করা যাবে না বা পরিদর্শনকারী ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখাতে শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করানো যাবে না। কিন্তু নীতি বা প্রজ্ঞাপনে এমন সব বিষয়ের উল্লেখ থাকলেও হরহামেশাই ঘটতে থাকা বিপরীত চিত্র দেখে মনে হয়, এগুলো যেন শুধুই তাত্ত্বিক বিষয়, যার কোনো প্রায়োগিক দিক নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে এই বিপরীত চিত্রের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে: যেমন– ক. আড়াই ঘণ্টা রোদে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা; খ. অতিথিকে স্বাগত জানাতে রোদে পুড়ল শিক্ষার্থীরা; গ. বৃষ্টিতে ভিজে সড়কে দাঁড়িয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা; ঘ. পাঠদান বন্ধ রেখে শোভাযাত্রা; ঙ. তিনি আসবেন বলে...; চ. পরীক্ষার্থীদের রোদে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো প্রকৌশলীর সংবর্ধনা ইত্যাদি। তবে এবার আগের সবকিছু ছাপিয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের কাঁধে ওঠার ঘটনা ঘটেছে। কেউ কেউ এটাকে নিছক একটি খেলার অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ আবার জুতা পায়ে কাঁধে ওঠাকে অমানবিক, বিবেকবর্জিত কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেন চাইলেই কাঁধে ওঠা যায়, শুধু জুতা পায়ে দিয়ে ওঠাটা ঠিক হয়নি। তবে এসব ঘটনা যে আসলেই শিশু অধিকার এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘন, সেটা কেন যে স্কুল কর্তৃপক্ষ এত দিনেও আঁচ করতে পারেনি, বুঝতে পারছি না। এটা যদি ওই স্কুলের রেওয়াজ হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে অবিলম্বে বিষয়টি বন্ধ করা উচিত। এর আগে প্রধান অতিথি হিসেবে আগতরাও একই কাজ করেছিলেন। যদিও সাম্প্রতিক ঘটনায় প্রশাসনিকভাবে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। তবে এর ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়। তবে তার সংখ্যা খুবই কম। কিছু বিশিষ্টজন বা জনপ্রতিনিধি প্রচলিত এসব অপসংস্কৃতির অবসান চান বলেই হয়তো এমনটা হয়েছে: যেমন– ক. রাস্তায় শিক্ষার্থী, ক্ষুব্ধ মন্ত্রী; খ. শিক্ষার্থীদের দাঁড় করিয়ে অভ্যর্থনা, ক্ষুব্ধ মন্ত্রী; গ. রাস্তায় শিক্ষার্থীদের দাঁড়ানো দেখে নেমে পড়লেন শিক্ষামন্ত্রী; ঘ. সংবর্ধনার নামে রাস্তায় শিক্ষার্থীদের দাঁড় করানোর অভিযোগে মামলা ইত্যাদি। এর বাইরে সাম্প্রতিক আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বনির্ধারিত একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়সূচিতে পরিবর্তন এনেছেন শুধু চলমান মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে যেন কোনো সমস্যা না হয়, সে জন্য। আমরা এই বিষয়টিকে স্বাগত জানাই। শিশুদের অধিকারের বিষয়ে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এ রকম সংবেদনশীলতা অবশ্যই শিশুদের অধিকার নিশ্চিতে অন্যদের সচেতন করবে।

> শিক্ষার্থীদের কেন রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে ? কেনই-বা সংবর্ধনা কিংবা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরই ব্যবহার করতে হবে? শিক্ষকই-বা কী করবেন? হয়তো পেশাগত বিভিন্ন বিষয় জড়িত থাকে এর সঙ্গে। আইনের বিধিনিষেধ থাকার পরও পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটিয়ে অভিভাবকদের পূর্বানুমতি ব্যতীত শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার বিষয়টি অরক্ষিত রেখে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো ব্যবহার কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না

জনপ্রতিনিধি বা বিশিষ্টজনের সংবর্ধনার জন্য শিক্ষার্থীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা এ দেশে নতুন নয়। এসব ঘটনা যে শুধু এখন ঘটছে তা নয়। এটা মনে হয় আমাদের ঐতিহ্য (!)। স্কুলজীবনে আমরাও এসব ঐতিহ্যের মুখোমুখি হয়েছি। তখন হয়তো এসব বিষয় সামনে আসেনি। এখন তথ্যপ্রযুক্তির যুগ, এখন সবাই জানতে পারে, তাই সচেতনতার মাত্রাটাও বেশি। এটি অবশ্যই ভালো একটি বিষয়। তবে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রেখে শিক্ষার্থীদের চৈত্রের প্রখর রোদ বা কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রেখে সম্মান প্রদর্শনের বিরাজমান অপসংস্কৃতির পরিচর্যা অব্যাহত রেখে যারা এখনও কোমলমতি শিক্ষার্থী তথা শিশুদের অধিকারের বিষয়টি গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করে চলেছেন, তাদের আইনের আওতায় আনার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই দু-একটি নির্দেশনা বা মৃদু ভর্ৎসনা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। এটাই সবচেয়ে শঙ্কার কথা। যারা সংবর্ধিত হচ্ছেন বা যারা সংবর্ধনা দিচ্ছেন, তারা কি কখনও ভেবে দেখেন না যে, তারা তাদের আনন্দ ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের ওপরে কষ্টের আবহে আরোপ করছেন। এভাবে জোর করে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে এমন কঠিন সম্মান প্রত্যাশী হওয়াটা কতটুকু সমীচীন? আমি একটি বিষয় বুঝতে পারি না, শিক্ষার্থীদের কেন রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে? কেনই-বা সংবর্ধনা কিংবা অন্য কোনো অনুষ্ঠানে কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরই ব্যবহার করতে হবে? এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কোনো বিকল্প না থাকায় বাধ্য হয়ে হয়তো তারা শিক্ষকদের নির্দেশ মানেন। শিক্ষকই-বা কী করবেন? হয়তো পেশাগত বিভিন্ন বিষয় জড়িত থাকে এর সঙ্গে। আইনের বিধিনিষেধ থাকার পরও পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটিয়ে অভিভাবকদের পূর্বানুমতি ব্যতীত শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার বিষয়টি অরক্ষিত রেখে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো ব্যবহার কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। তাছাড়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিবেচনায় নিলে এ ক্ষেত্রে শুধু শিক্ষার্থীদেরই দুর্ভোগ পোহাতে হয় না, দুর্ভোগ পোহাতে হয় অভিভাবকসহ স্থানীয় সাধারণ জনগণেরও। হাজার হাজার সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীকে সময় নষ্ট করে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করার সব আয়োজন চূড়ান্ত করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলা বন্ধ হোক। অমার্জিত ক্ষমতা, বিত্ত ও প্রভাবের বিনিময়ে যেসব ক্ষমতাধর অব্যাহতভাবে বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দেন, তাদের বোধোদয় ঘটা জরুরি। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে এসব অপসংস্কৃতির চর্চা প্রতিরোধে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

ashadullah.bd@gmail.com